আজকের কাগজ

তারিখ ...28 APR 1994 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

60

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেও শিশু শ্রমিক বাড়বে কেন?

বিনোদ দাশগুপ্ত

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন এ যুগে। কেবল আজকের দিনে নয়, এর প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকেই বলছেন এদেশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন থাকার সময় থেকে। কিন্তু সে সময় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা দূরে থাক এই শিক্ষার হার সামান্য বাড়ানোরও সুযোগ ছিল না।

বিদেশী (পশ্চিমা) শাসকরাও এদেশ ছেড়েছে অনেক দিন আগে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ বছর হয়ে এলো সাম্রাজ্যবাদী শাসনাবসানের। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও শিক্ষার অন্য স্তরের কথা বাদ দিলেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

এদিকে গত ৫০, বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ (পূর্বের পূর্ব বাংলা) যে দু'দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করলো। প্রথম দফা স্বাধীনতা অর্জনের পর (১৯৪৭ সালে) এদেশ অন্তর্ভুক্ত হলো পাকিস্তানের। আর দ্বিতীয় দফায় পাকিস্তান থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ নামে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে। অতি সংগত কারণে পাকিস্তানের শাসনাধীনে থাকাকালীন ২৪ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা বা অন্য কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। অবশ্য এ রূপ কোন সুযোগ-সম্ভাবনাও ছিল না। পাকিস্তানী শাসকরাও তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে তাদের সম্পূর্ণ একটি অধীন এলাকা হিসেবে শাসন ও শোষণ করেছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের বয়সও ইতিমধ্যে ২২ বছর গত হয়েছে। এর মধ্যে বহু সরকার ক্ষমতায় এসেছে, বিদায় নিয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি সরকারই শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত বিস্তারের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার কথা বলে আশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার আশ্বাসদানের ভিত্তিতে জনগণকে নানা আশার বাণী শোনাতে কখনও কুণ্ঠিত হয়নি। হালে তো কিছু দিন আগে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুই হয়ে গেছে বেশ আড়ম্বড়পূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে। কিন্তু এসবের বাস্তব প্রতিক্রিয়া বা পরিণতি কি?

শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ব্যর্থতা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এত দীর্ঘ সময়েও এদেশের গণশিক্ষার হার স্বাধীনতা পূর্বকালের চেয়ে ৫-৭ শতাংশের বেশি বাড়েনি। কিন্তু বছরে তা যদি এক শতাংশ হারেও বাড়ানো সম্ভব হতো তবে আমাদের শিক্ষার হার এর মধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা ছিল। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের প্রণীত হিসেবের গড়মিল আছে অবশ্যই। তবু মোটামুটি দেখা যায় যে কোন রকমে নিজেদের নামটা লিখতে জানা লোকদের নিয়েও স্বাক্ষর লোকের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৩০ শতাংশের মধ্যে। এখন পর্যন্ত এতে কোন সংশয় নেই যে দেশের ৭৫ থেকে ৭০ শতাংশ লোক আজো সম্পূর্ণ নিরক্ষর বা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলোঃ এরূপ দুঃখজনক অবস্থার কারণ কি? এর জবাবে অনেক কথাই বলা যায় এবং বাস্তবে এ জন্যে নানা অজুহাত দাঁড়ও করানো হচ্ছে। কেউ কেউ সাধারণ মানুষের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে হয়তো বলতে চাইবেন যে ব্যাপক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহহীনতার কারণেই এখানে শিক্ষা হারের আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। আবার রাজনীতিক মহলের অনেকেই এর সম্পূর্ণ দোষ চাপাতে চাইবেন ক্ষমতাসীন দল বা সরকারের উপর। কিন্তু এটা করে বিশেষ লাভ নেই এই কারণে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত বছরগুলোর মধ্যে দেশের বড় দলগুলোর প্রায় সকলেই সরকারী ক্ষমতার গদীতে আসীন হয়েছেন। কাজেই তারা কেউ অন্যের সমালোচনা বেশি করতে পারবেন না।

শুধু আইন করে হয় না

আসলে এ ক্ষেত্রে তাদের সকলেরই মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে। বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট সরকার এবং অন্যান্য মহল শিক্ষার (বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার) অগ্রগতি যে একেবারে চায়নি তা নয়। কিন্তু শিক্ষার অগ্রগতি যে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা বা প্রেক্ষিত নিরপেক্ষ নয় সেই কঠোর সত্যটি অনেকেই মনে রাখেন না। কিংবা মনে রাখলেও তা কাজে লাগান না। সমাজ বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন আইনও তাই অনেক সময় চেষ্টা করেও কার্যকর করা যায় না। এ জন্যেই যৌতুক বিরোধীসহ অনেক আইনই এদেশে কখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বা অধ্যাদেশও সে কারণে শিক্ষা হার বিস্তারের কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা হতে পারে না। এরূপ এক বিধান চালু করার ঘোষণা দিয়ে কোন কোন শাসক দল মনে করতে পারেন যে শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের ব্যাপারে যা করার সেটা তারা করে ফেলেছেন। এ জন্যে তাদের আত্মসন্তুষ্টির মাত্রা বাড়তে পারে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা তাতে একেবারে ক্ষীণ, অন্ততঃ আমাদের মত দেশে।

খাদ্যহীনতা থেকে শিক্ষাহীনতা

কেন এমন হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই তুলবেন অনেকে। একটু ভাবলেই এর জবাবও পেয়ে যাবেন তারা। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম রাষ্ট্রগুলোর একটি। প্রায় তিন চতুর্থাংশ লোকের অবস্থান এখানে দারিদ্র্য সীমার নিচে। গোটা পরিবারের জন্যে দিনে দু'বেলা মাত্র আহারের সংস্থান করাও এখানে ব্যাপক সংখ্যক লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

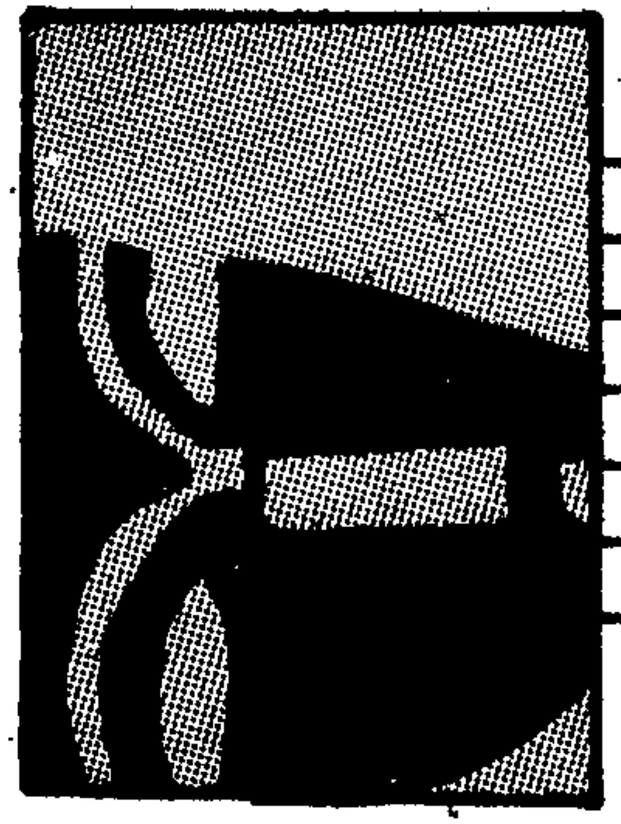

প্রকৃতপক্ষে এসব দেশে তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি চাপিয়ে দেয়ার নামে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আরো দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়ে তারা শিশু শিক্ষার বদলে শিশু শ্রমকেই অবাধ তথা নিশ্চিত করে তুলছে। এখানেই হচ্ছে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা। এ জন্যেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের এত অভিযান এত চক্রান্ত। কাজেই গরীব দেশগুলোকে আরো বেশি শিক্ষা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা।

এই অবস্থায় তাদের পক্ষে নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানো, তো বড় কথা অনেক সময় তাদের গায়ে সামান্য একটু জামাকাপড় দেয়াও সম্ভব হয় না। এ জাতীয় পরিবারের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদেরকে তাই ৩/৪ বছর বয়স থেকেই অন্ততঃ নিজেদের পেট চালাবার মত কঠোর জীবন সংগ্রামে নামতে হয়। অগণিত এসব ক্ষুধার্ত, করুণ অপুষ্টিগ্রস্ত এবং শীত-গ্রীষ্ম-কাতর ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেই বা কি না হলেই বা কি? আইনগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের দুয়ার খোলা থাকলেও সেখানে ঢুকার ক্ষমতা এসব ভাগ্যাহত ছেলে-মেয়ের নেই। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ যদি তাদের অত্যন্ত প্রচণ্ড হয় তবে বিদ্যালয়ে ঢুকতে হবে তাদেরকে পেটে সারাক্ষণ সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুন, প্রায় পোশাক শূন্য উদম শরীর এবং চির পুষ্টিহীনতাক্লিষ্ট নানা রোগে জর্জরিত দেহ নিয়ে। কিন্তু বই খাতা পত্র পেন্সিল ছাড়া রাস্তার শিশুর মত এই ছেলে-মেয়েদেরকে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের প্রাথমিক স্কুলে ঢুকতে দেবেন কি-না আমরাও জানি না। যদি ঢুকতে দেনও তবে পেটের অনন্ত ক্ষুধার জ্বালা এবং পোশাকহীন দেহের উপর বৈরী আবহাওয়ার আক্রমণে তারা যে শিক্ষকদের আলোচিত পাঠে মন দিতে পারবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

অর্থাৎ স্কুলে গিয়ে একদিকে তারা কিছুই শিখতে পারবে না, অন্যদিকে কোন রকমে নিজেদের দু'বেলা আহার সংস্থানের জন্যে কঠিন সংগ্রাম করার সুযোগটিও হারাবে। ফলে ছাত্র শিক্ষক এবং জাতি সবাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সামান্যতম সুফলও লাভ করতে পারবে না এর থেকে কেউ।

এ জন্যেই প্রতি বছর যে হারে শিশুর জন্ম বা স্কুল বয়সী শিশুর সংখ্যা বাড়ছে সে হারে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা বাড়ছে না। উর্ধ্বে কোন কোন সময় হয়তো দুই হার সমান থাকছে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের গুরুতর পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে হলে শিশু সংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রতি বছর স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুর হার বেশি হতে হবে। কিন্তু এমন কোন অবস্থা এখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

শিশু শিক্ষা ও শিশু শ্রম

অনুন্নত দরিদ্র কোন দেশে শিক্ষার অনুকূল এমন একটি অবস্থা আপনা আপনি কখনও সৃষ্টি হয় না। এই অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের। দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত অনেক নাগরিকের আয়ের নিয়মিত উৎস বলতেই কিছু নেই। নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্যে এ জাতীয় অগণিত অভিভাবককে নিজেরা বেঁচে থাকার জন্যেও তাদের শিশু সন্তানদের উপরই নির্ভর করতে হয়। এই অভিভাবকদের পক্ষে সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর কথা ভাবা কি সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র উন্নয়নশীল কোন দেশেই আজ পর্যন্ত ব্যাপক জনগণের ন্যূনতম অর্থনৈতিক সংগতির ব্যবস্থা না থাকার কারণে শিক্ষার অগ্রগতি সাধন করা যায়নি। আবার দেখা যায় যেখানে এই ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু করা সম্ভব হয়েছে সেখানেই এক সঙ্গে শিক্ষার অবিশ্বাস্য অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নত দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য নিয়েও শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রায় কোন অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না।

প্রকৃতপক্ষে এসব দেশে তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি চাপিয়ে দেয়ার নামে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আরো দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়ে তারা শিশু শিক্ষার বদলে শিশু শ্রমকেই অবাধ তথা নিশ্চিত করে তুলছে। এখানেই হচ্ছে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা। এ জন্যেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের এত অভিযান এত চক্রান্ত। কাজেই গরীব দেশগুলোকে আরো বেশি শিক্ষা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা।

বিনোদ দাশগুপ্ত : প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংস্থ।